কালের কণ্ঠ

১৬-০৭-২০২৬, পৃষ্ঠা- ১১

সাক্ষাৎকার

এআইয়ের ইতিবাচক ব্যবহারকে আমরা উৎসাহ দিচ্ছি

বিশ্বজুড়ে এআই বিপ্লব উচ্চশিক্ষাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কী ধরনের পরিবর্তন নিয়ে এসেছে বলে আপনি মনে করেন?

—বর্তমানে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই) এবং মেশিন লার্নিংয়ের যে বিপ্লব হচ্ছে, সেটা বাংলাদেশেও আমরা কতটুকু কাজে লাগাব, সেটা ভাবার সময় এসেছে। এর ইতিবাচক দিক হলো, এটা অনেক এফিশিয়েন্সি (কার্যক্ষমতা) বাড়াবে। কিন্তু এর ফলে কর্মী ছাঁটাইয়ের প্রবণতাও বাড়বে। প্রতিবছর ২২ লাখ শ্রমবাজারে প্রবেশ করে। আমাদের জীবনযাত্রাটাকে এমনভাবে পরিবর্তন করতে হবে, যাতে বেকারত্ব না হয়। অবশ্যই আমরা এআই ও মেশিন লার্নিংয়ের সুযোগ-সুবিধা বাংলাদেশেও ব্যবহার করতে চাই। কিন্তু একই সঙ্গে যাতে এর ফলে মানুষ বেকার না হয়ে যায়, সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে।

আপনাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে এআই নিয়ে পরিকল্পনা কী?

—কর্মবাজারের চাহিদার কথা মাথায় রেখে আমরা এরই মধ্যে ডাটা সায়েন্স, মেশিন লার্নিং এবং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই)—বিষয়গুলো পড়াচ্ছি। মাস্টার্স পর্যায়ে এর জন্য আলাদা প্রোগ্রাম আছে। ব্যাচেলর পর্যায়েও এই বিষয়গুলো পড়ানো হচ্ছে।

এআইয়ের ওপর কী কোনো প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে? অ্যাসাইনমেন্ট বা গবেষণাপত্র তৈরির কাজে চ্যাটজিপিটি বা এআইয়ের ব্যবহারকে আপনি কিভাবে দেখেন?

—আমরা শিক্ষকদের জন্য নিয়মিতভাবে বিভিন্ন আধুনিক বিষয়ে শিক্ষা বা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করছি। গত জুন মাসে শিক্ষকদের জন্য আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড মেশিন লার্নিংয়ের ওপর এক সপ্তাহের প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছিল। আমাদের ফুলটাইম শিক্ষক ৩৭০ জন। তাঁদের মধ্যে ৮৫ জন আবেদন করেছিলেন। তাদের আমরা এ ব্যাপারে শিক্ষা দিচ্ছি পর্যায়ক্রমে। তাঁদের আমরা এআইয়ের ইতিবাচক ব্যবহার ও এর নেতিবাচক দিকগুলো কিভাবে পরিহার করা যায়, সেই প্রশিক্ষণ দিচ্ছি। আমাদের শিক্ষকদের গবেষণার জন্য অনেক সুযোগ-সুবিধা ও ছাড় দেওয়া হয়। যেসব অধ্যাপক গবেষণা করেন, তাঁদের এখানে ৩০ ক্রেডিটের বদলে ২৭ ক্রেডিট পড়ানোর সুযোগ দেওয়া হয়। অর্থাৎ তিন ক্রেডিট ছাড় দেওয়া হয়, যাতে গবেষণা করতে পারে। যাঁরা গবেষণা করছেন, প্রকাশনায় যাচ্ছেন, তাঁদের জন্য আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই)—এটা একটা টুল। তারা এটা ব্যবহার করে। তাঁরা এআই সম্পর্কে খুব ভালো জানে ও ইতিবাচকভাবে ব্যবহার করে। এআইয়ের ইতিবাচক ব্যবহারের ব্যাপারে আমরা সবাইকে উৎসাহ দিচ্ছি। কিন্তু আবার দেখেন, চ্যাটজিপিটি বা এআইয়ের মাধ্যমে কিন্তু জালিয়াতিও হচ্ছে। তাই খুব সাবধান থাকতে হচ্ছে, যাতে এর কারণে গবেষণামূলক কাজে নকল বা জালিয়াতি না হয়।

ভবিষ্যতের কর্মবাজার মাথায় রেখে কারিকুলামে কী ধরনের পরিবর্তন আনা দরকার?

—বছরে বাংলাদেশে ২২ লাখ লোক শ্রমবাজারে প্রবেশ করে। কিন্তু এর মধ্যে আনুষ্ঠানিক

অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ ফরাসউদ্দিন
চেয়ারপারসন, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এবং
প্রতিষ্ঠাতা উপাচার্য, ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি

> কর্মবাজারের চাহিদার কথা মাথায় রেখে আমরা এরই মধ্যে ডাটা সায়েন্স, মেশিন লার্নিং এবং আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই)—বিষয়গুলো পড়াচ্ছি। মাস্টার্স পর্যায়ে এর জন্য আলাদা প্রোগ্রাম আছে। ব্যাচেলর পর্যায়েও এই বিষয়গুলো পড়ানো হচ্ছে

ক্ষেত্রে কর্ম সৃষ্টি হয় ছয়-সাত লাখ, আর বিদেশে যায় সাত-আট লাখ। এভাবে ১৪-১৫ লাখ লোকের কর্মসংস্থান হয়। বাকিরা ডিসগাইস আনএমপ্লয়মেন্ট বা ছদ্মবেশী বেকারত্বের দিকে চলে যায়। এজন্য তাঁদের যদি আমরা ইতিহাস, সংস্কৃতি বা এ ধরনের বিষয়গুলোর পরিবর্তে মার্কেটিং, কম্পিউটার সায়েন্স, ফার্মেসির মতো চাহিদাসম্পন্ন বিষয়ে বেশি আকৃষ্ট করতে পারি, তাহলে আরো অনেক মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে। ৩০ বছর আগে ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি আমরা যখন শুরু করেছিলাম তখন সায়েন্স টেকনোলজিতে শিক্ষার্থী ছিল শতকরা ৪০ শতাংশ। এখন সেখানে শতকরা শিক্ষার্থী ৫৫ শতাংশ। আমরা ওদিকে যাচ্ছি, যাতে কর্মবাজারে আমাদের গ্র্যাজুয়েটরা আইসিএস, ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং (ইইই) এবং মেশিন লার্নিংয়ে দক্ষ হয়ে চাকরির বাজারে ভালোভাবে ঢুকতে পারেন। এ ছাড়া আমরা করপোরেট সেক্টরের সঙ্গে আমাদের শিক্ষার কারিকুলামটাকে সমন্বয় করতে চাই, যাতে করপোরেট চাহিদা অনুযায়ী আমাদের কারিকুলাম সাজাতে পারি। আমাদের খুব শক্ত সুপারিশ হলো, সরকার যদি এই করপোরেট সেক্টর ও উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমন্বয় করে বাস্তবসম্মত সিলেবাস করে তাহলে শিক্ষার্থীরা কর্মবাজারের জন্য আরো বেশি উপযুক্ত হবে। এন্টারপ্রেয়ারশিপ ডেভেলপমেন্ট সেন্টারের মাধ্যমে আমরা শিক্ষার্থীদের সেলফ এমপ্লয়মেন্ট বা আত্মকর্মসংস্থানে অনেক বেশি উৎসাহিত করছি। আমরা আন্তর্জাতিক ভাষা শিক্ষার একটা সেন্টার করেছি, যাতে শিক্ষার্থীরা পড়াশোনার পাশাপাশি জাপানি, কোরিয়ান ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ভাষাও শিখতে পারে। জাপান ও কোরিয়াতে আমাদের বাংলাদেশি শিক্ষিত-দক্ষ লোকদের অনেক চাহিদা আছে। সেখানে যাতে আমাদের গ্র্যাজুয়েটরা গিয়ে কর্মসংস্থানের সুযোগ পান এর জন্য ভাষা জানা জরুরি। আমরা ভাষাবিষয়ক ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট প্রোগ্রাম শুরু করতে যাচ্ছি। মান্দারিন (চীনা) ও আরবি ভাষাশিক্ষাও চালু করা হবে।

আমাদের জনশক্তিকে কিভাবে আমরা উপযুক্ত হিসেবে গড়ে তুলতে পারি? আপনার পরামর্শ বা সুপারিশ কী?

—আমাদের সুপারিশ হলো—অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনার পর পরবর্তী চার বছর ব্যাপকভাবে বৃত্তিমূলক (ব্যাবহারিক বা ভোকেশনাল) শিক্ষা ব্যবস্থার প্রসার করতে হবে। চাহিদাসম্পন্ন ২০০-৩০০ ট্রেড আছে, যেগুলাতে শিক্ষার্থীদের পারদর্শী করতে হবে। তাহলে আমরা ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট বা জনমিতিক লভ্যাংশের মুখ দেখব। দেশে ১৫ থেকে ২৯ বছর বয়সী মানুষের সংখ্যা প্রায় পাঁচ কোটি। বিশ্বের মাত্র ২৫টা দেশের জনসংখ্যা পাঁচ কোটি। সত্যিকারভাবে পাঁচ কোটি লোককে যদি বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহলে কিন্তু তাদের কর্মজীবন দীর্ঘতর হবে। তারা তাদের পরিবার বা মা-বাবাকে দেখতে পারবে। এর জন্য কারিগরি, ইঞ্জিনিয়ারিং, সায়েন্স ও টেকনোলজি শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে। বিশ্বের যেসব দেশ ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজি এবং আইসিএসে উন্নত তারাই কিন্তু অনেক বেশি অগ্রগতি করছে।

বর্তমানে নারীরা বড় পরিসরে চাকরিতে যাচ্ছে। কিন্তু বেশির ভাগই যাচ্ছে ব্যাংকিং খাতে। কিন্তু আমরা চাচ্ছি যে মহিলারা বড় পরিসরে কমার্স, ইন্ডাস্ট্রি, ইঞ্জিনিয়ারিং—এগুলাতে যাক। শিল্পক্ষেত্রে চাকরির জন্য আমাদের গ্র্যাজুয়েটদের আমরা তৈরি করব। ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে একটা কো-অপারেটিভ সিস্টেম করতে হবে, দুই সেমিস্টার এখানে পড়বে, অতঃপর এক সেমিস্টার ইন্ডাস্ট্রিতে যাবে। ওইখান থেকে শিখে আসবে। আমরা সুপারিশ করছি, যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বে তারা শীতকালে এক সেমিস্টারের জন্য গ্রামেগঞ্জে যাবে কৃষকের সঙ্গে এক সেমিস্টার থাকবে, এর জন্য থাকবে ৯ ক্রেডিট। তারা দেখবে কত কষ্ট করে কিষান-কিষানিরা আমাদের খাওয়াচ্ছে। ওইখানে তারা জীবনধর্মী বা বাস্তবধর্মী জ্ঞান অর্জন করবে, শিখবে। তারা স্থানীয় এলাকার সম্পদ ম্যাপিং করবে, জন্মনিবন্ধন, পরিকল্পিত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, টিকা কার্যক্রম, পরিবেশ সংরক্ষণ, এগ্রো-ইন্ডাস্টিজ শুরু করার সম্ভাবনা—এসব বিষয়ে তারা চলমান ও ভবিষ্যতে শুরু হওয়া কার্যক্রম সফল করতে সাহায্য করবে। এভাবে এসব শিক্ষার্থী ভবিষ্যতে জীবনধর্মী ও প্রত্যয়ী নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হবে।

▷ সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **হাবিব তারেক**